‘বাংলার বাঘ’ স্যার আশুতোষ

মৌলি ঘোষ

‘দশজনের মধ্যে একজন হতে হবে,’ ‘পড়ো তাহলেই সব জানতে পারবে,’ ‘ভাল করে পড়া চাই’—শৈশবের পিতৃ-উপদেশগুলি আক্ষরিক ও আন্তরিকভাবে পালন করলেই যে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জীবন। বাবা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন ছিল পুত্রকে তিনি দশজনের মধ্যে একজন করে গড়ে তুলবেন; এক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টারও ত্রুটি ছিল না। পুত্র তাঁর অসাধারণ মেধা, ইচ্ছাশক্তি ও নিষ্ঠায় পিতার সে-স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে হয়ে উঠেছিলেন সূর্যের মতোই ভাস্বর। সেই কারণেই তিনি শুধুমাত্র দশের মধ্যে এক নন, শতাব্দীর অন্যতম মনীষী। জন্মের সার্ধশতবর্ষেও তাঁর কীর্তি অমলিন।

জন্ম ১৮৬৪ সালের ২৮ জুন। আশুতোষের উন্নতির মূলে ছিল পিতামাতার উন্নত চরিত্র, আদর্শবোধ ও দূরদর্শিতার প্রবল প্রভাব। পিতা গঙ্গাপ্রসাদ ছিলেন হুগলি জেলার বলাগড়ের জিরাট গ্রামের বিখ্যাত মুখোপাধ্যায় বংশের সন্তান। দাদা দুর্গাপ্রসাদের প্রচেষ্টা, নিজের নিষ্ঠা আর মেধায় তিনি মেডিকেল কলেজের সব পরীক্ষায় প্রথম হন। বিখ্যাত চিকিৎসক গঙ্গাপ্রসাদ বহু ব্যস্ততার মাঝেও অতন্দ্র যত্ন আর সতর্কতায় গড়ে তুলেছিলেন পুত্র আশুতোষের জীবন। বিখ্যাত পিতা জেমস্ স্টুয়ার্ট মিলের সঙ্গে প্রখ্যাত পুত্র জন স্টুয়ার্ট মিলের যেমন mental affinity-র বাঁধন ছিল, ঠিক তেমনি পুত্র আশুতোষের সঙ্গে পিতা গঙ্গাপ্রসাদের মানসিক অন্তরঙ্গতা ছিল গভীর।

চক্রবেড়িয়ার বঙ্গবিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে আশুতোষ ভর্তি হন পিতার প্রতিষ্ঠিত সাউথ সুবার্বন স্কুলে। প্রধান শিক্ষক শিবনাথ শাস্ত্রী পরে লিখেছিলেন, ‘‘আশুতোষকে পাইয়া যেন হাতে আকাশ পাইলাম। জীবনে এমন ছাত্র আর দুইটি দেখি নাই।’’ প্রখ্যাত পণ্ডিতদের গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত করলেন গঙ্গাপ্রসাদ। আশুতোষ বাবার কাছে ব্লকম্যানের ভূগোলের একটি বই চাইলে, তিনি বাংলা-ইংরেজিতে ভূগোলের সব বই ও ম্যাপ কিনে এনে দিয়েছিলেন। একখানি বাংলা অভিধান চাইলে সবগুলি অভিধান নিয়ে এসেছিলেন। আশুতোষের কাছে অধ্যয়ন ছিল প্রাণের মুক্তি, আত্মার শান্তি!

আশুতোষ ১৮৭৯ সালে পনেরো বছর বয়সে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করলেন এনট্রান্স পরীক্ষা। পরের বছর ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। তাঁর সহপাঠী ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সামসুল হুদা প্রমুখ।

ওই বয়সেই লাইব্রেরিতে বসে তিনি পাঠ করতেন অঙ্কের বিদেশি ম্যাগাজিনগুলি। ইউক্লিডের জ্যামিতির থিয়োরেমের একটি প্রমাণ তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন। গণিতের অধ্যাপক বুথ সাহেবের আগ্রহে তিনি সেটি পাঠিয়েছিলেন 'Cambridge Messenger of Mathematics' নামক সুবিখ্যাত পত্রিকায়। ষোলো বছরের আশুতোষের প্রবন্ধ প্রকাশিত হল সাদরে। বুথই তাঁকে বলেছিলেন গণিতের জগতে প্রবেশ করতে হলে ফরাসি শেখা দরকার। নিজের চেষ্টায় আশুতোষ শিখে ফেললেন ফরাসি ভাষা। ফরাসি গণিতের অবতার লাপ্লাসের প্রায় সব গ্রন্থই তাঁর অধিগত হয়েছিল। বি এ ক্লাসের প্রথম বর্ষেই তাঁর এম এ ক্লাসের বইগুলি পড়া হয়ে গিয়েছিল। বি এ পরীক্ষায় প্রথম হলেন। পাঠ্য বিষয় ছিল ইংরেজি, অঙ্ক, সংস্কৃত, দর্শন ও অতিরিক্ত বিষয় গণিত। দর্শনে তিনি ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯৬ পেয়ে পরীক্ষককে চমৎকৃত করেছিলেন। পেলেন প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি। পরের বছর গণিতে এম এ পরীক্ষা দিয়ে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করলেন। তার পরের বছর দ্বিতীয়বার এম এ পরীক্ষা দিলেন। এবার গণিতের সঙ্গে ছিল পদার্থবিদ্যা। আবারও প্রথম।

বাবার ইচ্ছে ছিল আশুতোষ হাইকোর্টের বিচারপতি হবেন। আশুতোষ সে-ইচ্ছেকে মূল্য দিয়ে বি এ পড়ার সময় থেকেই আইন পড়া শুরু করেছিলেন। ১৮৮৮ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন তিনি। কয়েক বছর পর 'ডক্টর অফ ল' উপাধি লাভ করলেন। মুখচোরা ছেলে আদালতে গিয়ে যদি বক্তৃতা না দিতে পারে, সেই চিন্তায় একদিন গঙ্গাপ্রসাদ ছেলেকে ডেকে টুলের উপরে উঠে 'প্যারাডাইস লস্ট' আবৃত্তি করতে বললেন। কীভাবে বক্তৃতা করতে হয় তারও একটি বই কিনে দিলেন। আশুতোষ নিরলস চেষ্টায় হয়ে উঠলেন অসাধারণ বক্তা। দীর্ঘ পনেরো বছর একঘণ্টা করে পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত পড়লেন। সংস্কৃত এম এ-তেও প্রথম স্থান অধিকার করলেন। পালিভাষায় পাণ্ডিত্যের জন্য পেলেন 'সমুদ্ধাগমচক্রবর্তী' উপাধি। এমন বর্ণময় ছাত্রজীবন শুধুমাত্র মেধার ফলশ্রুতি নয়—নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টাই মানুষকে মহৎ করে। আশুতোষের ছাত্রজীবন তাই আজও বিশেষভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ।

এবার শুরু হল আশুতোষের জীবনের দ্বিতীয়পর্ব। মাত্র চব্বিশ বছরেই তিনি অঙ্কের পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন। প্রথমে তিনি মেট্রোপলিটন কলেজে চাকরি নিয়েছিলেন। ইচ্ছে ছিল অঙ্কের অধ্যাপক হয়েই জীবন কাটাবেন। কিন্তু আশুতোষের মতো কর্মবীরের জীবন ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, ঈশ্বর মহৎ মানুষকে মহৎ কার্য সম্পাদন করার দায়িত্ব প্রদান করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বৃহত্তর কর্মজীবনের জন্য নিজের অজান্তেই প্রস্তুতি শুরু করলেন। কাকা রাধিকাপ্রসাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য নির্বাচিত হলে বাড়িতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনিটস্‌গুলি আসত। সেই নীরস পত্রিকাগুলি ছাত্র আশুতোষ অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হলেন তিনি। ১৯০৪ সালেই তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ গ্রহণ করলেন। ১৯০৬-এ গ্রহণ করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব। কর্মবীর আশুতোষের জীবনে কাজই ছিল উপাসনা। সেইকারণে একসঙ্গে দুটি দায়িত্বই কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন, কোথাও এতটুকু বিচ্যুতির অবকাশ রাখেননি।

প্রথম পর্যায়ে ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত আটবছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। লর্ড কার্জন ১৯০২ সালে আইন প্রণয়ন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা খর্ব করতে চেয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালি তথা ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠা খর্ব করাও ছিল তাঁর অন্যতম

উদ্দেশ্য। কিন্তু আশ্চর্য, আশুতোষ ওই আইনের কাঠামোর মধ্যেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা বিন্দুমাত্রও খর্ব হতে দেননি তিনি। তাঁর আমলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস হল—‘Reorganisation, reform and revolution’ -এর ইতিহাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি বিভাগে আমূল সংস্কার সাধিত হল। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল একটি পরীক্ষাশালা মাত্র। একে তিনি পরিণত করলেন ‘Teaching University’-তে। জাতির জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ উপযোগিতা কোথায়, সেই বিষয়টি তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন পরবর্তী কালে সমাবর্তনের এক ভাষণে। সেদিনের উপাচার্য বলেছিলেন, ‘‘To my mind the University is a great store- house of learning, a great bureau of standards, a great work-shop of knowledge, a great laboratory for the training of men of thought as well as of men of action. The University is thus the instrument of the state for the conservation of knowledge, for the application of knowledge, and above all, for the creation of knowledge makers.” বিশ্বের আর কোনও উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন সংজ্ঞা দিতে পারেননি।

উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ধ্যানজ্ঞান ছিল শিক্ষার প্রসার। শিক্ষাকে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সুবিন্যস্ত করার লক্ষ্যে তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল সুপরিকল্পিত। স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির পাঠক্রম নির্ণয়ের উপর জোর দিয়েছিলেন তিনি। স্কুল ও কলেজে শিক্ষার মান যদি যথার্থ না হয় তবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও মানোন্নয়ন সম্ভব নয়—এইকথা ভেবেই তিনি শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি দৃঢ় করার উপর জোর দেন। শিক্ষকের ভূমিকা যে পাঠদানের ক্ষেত্রে কত জরুরি তা উপলব্ধি করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সেযুগের সেরা পণ্ডিতদের। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সপক্ষে ছিলেন তিনি। সহজ প্রশ্নই পরীক্ষাকে আতঙ্কমুক্ত করে, এই ছিল তাঁর অভিমত। আর সর্বোপরি তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির প্রবেশের বিরোধী ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল গণতান্ত্রিক পরিপার্শ্বেই ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক মধুর হয়ে ওঠে—শিক্ষার প্রকৃত বিকাশ সম্ভব হয়। শিক্ষাকে অবৈতনিক করে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলেই হবে শিক্ষার প্রসার। বর্তমানের জনশিক্ষার উদ্ভাবক ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। কুড়িটি নতুন বিষয়ের পঠন-পাঠন শুরু করে শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি কী ব্যাপক রূপ দিয়েছিলেন তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়! পালি, আরবি, বাংলা, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মুসলিম সংস্কৃতি, ভূবিদ্যা, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি, বাণিজ্যবিদ্যা, শরীরতত্ত্ব, রসায়নবিদ্যা, জড়বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের ফ্যাকাল্টি খোলা হয়েছিল। প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সি. ভি. রামন, সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশ্বখ্যাত পণ্ডিতদের তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করেছিলেন। ললিতকলা শিক্ষার প্রতি আগ্রহের কারণে তিনি শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এ-বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। শিল্পচর্চায় তাঁর গভীর মনোনিবেশের কথা জানা যায় অবনীন্দ্রনাথের কথায়। ডাক্তারি পড়ার ক্ষেত্রে তিনি শিক্ষাক্রম একবছর বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, যাতে হাতে-কলমে কাজ শেখার জন্য বেশি সময় পাওয়া যায় এবং সহজে কাজের সুযোগ মেলে। মৌলিক গবেষণার জন্য গবেষককে ডক্টরেট ডিগ্রি ও ডি ফিল উপাধি দেওয়ার প্রথা চালু করেন তিনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,

ডি ফিল প্রাপকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। এছাড়াও তিনি মায়ের নামে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রবর্তন করেন, সে-পুরস্কার প্রথম পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তাঁর স্বপ্ন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলার জন্য যে-জীবনব্যাপী পরিশ্রম আশুতোষ মুখোপাধ্যায় করেছিলেন, তা তপস্যারই সমতুল্য। বিরূপ মন্তব্য, বিরুদ্ধ পরিস্থিতি তাঁকে তাঁর লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। এইভাবেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধাতাপুরুষ।'

তাঁর ছাত্রবাৎসল্যের বহু কাহিনিই প্রচলিত। শত কাজের মধ্যেও তিনি কোনও মেধাবী দরিদ্র ছাত্রের কথা মনে রেখে তার পরীক্ষার ফি পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। কখনও বা ছাত্রের অনুরোধে উত্তরপত্রের পুনর্মূল্যায়ণের আদেশ দেন। এই বিরাট মাপের মানুষটির যথার্থ ছবি এঁকেছেন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ : ''যেমন বর্ষার মেঘ অপব্যয়ী, আকাশের তারা অপব্যয়ী, তেমনই এতটুকু জ্ঞান ফোটাতে বিরাটভাবে অপব্যয়ী ছিলেন এই মহাপুরুষ। বলতে পারি, ছোটর জন্য তিনি নিজেকে ঢেলে দিতে কৃপণতা করেননি, কার্পণ্য কোনদিন আসেনি তাঁর মনের ত্রিসীমানাতে।"

তরুণ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ পাশ করার পরই আহ্বান পেলেন আশুতোষের। এম এ ক্লাসে পড়াতে হবে—এই প্রস্তাব শুনে ভয়, সংকোচের কথা উপাচার্যকে জানালেন তিনি! উৎসাহ দিয়ে আশুতোষ তাঁকে বললেন, ''সাহস করো, উচ্চ সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাও, যাতে নিজের ইউনিভার্সিটির নাম, দেশের নাম উজ্জ্বল করতে পারো।" সুনীতিকুমার লিখেছেন, ''তাঁর এই উৎসাহবাণী কখনো ভুলিনি, তাঁর কথাগুলি এখনো আমার মনে মন্ত্রশক্তি যুক্ত হয়ে আছে।"

স্যার আশুতোষ ছিলেন খাঁটি বাঙালি। কথায়, ব্যবহারে, সামাজিকতায়, সংস্কৃতিরক্ষায়, পরিচ্ছদে—সর্বত্র ও সর্বদা তিনি বাঙালির শ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিলেন। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। পারিবারিক সংস্কার অতি যত্নে পালন করতেন। কোনও পরিস্থিতিতেই সে-আদর্শ ত্যাগ করতেন না। কার্যক্ষেত্র ছাড়া অন্য সময় তিনি ধুতি ও উপবীত ধারণ করে গর্বিত হতেন। যাঁরা স্বদেশি পোশাক ত্যাগ করেছিলেন ইংরেজ সরকারের ভয়ে, তাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রদর্শন করে নিজেকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরতেন এই বলে—''I the son of a Brahmin have not in my life felt ashamed to expose my sacred thread to the gaze of the foreigners."

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর প্রাণের টান। বহু সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করে তিনি বাংলায় উচ্চশিক্ষালাভের ব্যবস্থা করেছেন, স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের উপযোগী পুস্তক রচনার ব্যবস্থা করেছেন। বহু নিন্দুক তাঁকে ইংরেজদের স্তাবক বলেছেন। বিরূপ সমালোচনায় তিনি বিব্রত বা বিভ্রান্ত হননি; নিজের আদর্শবোধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকে যাবতীয় সমালোচনা উপেক্ষা করেছেন। জাতীয়তাবোধের পূর্ণপ্রকাশ লক্ষ করা গেছে তাঁর কাজের মধ্যে। জাতীয় গৌরবের স্মৃতি জাগ্রত করার জন্য প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ স্থাপন করেছিলেন তিনি। ওই বিভাগে নিযুক্ত করেছিলেন রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের মতো দেশবরেণ্য ঐতিহাসিকদের। ভারতের প্রতিটি প্রান্তের আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করে তিনি পরোক্ষে জাতীয় সংহতি স্থাপনেরই চেষ্টা করেছিলেন। শিক্ষার প্রসারেই দেশ ও দশের উন্নতি—এই সত্যে বিশ্বাসী আশুতোষ আমৃত্যু শিক্ষার প্রসারে নিরলস পরিশ্রম করেছেন।

আশুতোষের স্বদেশপ্রীতি তাঁর কর্মভাবনার মধ্যে দিয়েই প্রতিফলিত। তাঁর দেশই ছিল তাঁর ধর্ম, তাই দেশপ্রেমিক আশুতোষ বলতেন, “My religion is my country.”

১৯০৪ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রায়গুলি তিনি নিজেই লিখতেন। তাঁর রচিত রায়গুলি আইনবিষয়ের চিরন্তন সম্পদরূপে আজ গণ্য হয়। আশুতোষের প্রতিভা ছিল পরশপাথরের মতো, যা স্পর্শ করেছে তাই হয়ে উঠেছে সোনা!

প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন তিনি, কিন্তু জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত অনাড়ম্বর। জীবনে বিলাসিতার লেশমাত্রও ছিল না। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘‘আপনার চেয়ে যারা অনেক ছোট তাদের সবার কতখানি নিকট হয়ে উঠলো মানুষটি এতেই বড়লোকের যথার্থ পরিচয় পাই।” সে-পরিচয় আশুতোষ দিয়েছেন যখন গাড়ির ড্রাইভার তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন (আসবেন না জেনেই)। ঠিক সময়ে উপস্থিত হয়ে তিনি যথোচিত মূল্য দিয়েছেন আমন্ত্রণকারীর।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ মেধাবী সন্তান আজ অনায়াসে পাড়ি দেয় বিদেশে; স্বদেশ-সমাজ-পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব এড়িয়ে যেখানে আরও বেশি সুযোগ, আরও বেশি প্রাচুর্য। স্মরণ করি, আশুতোষের নিমন্ত্রণ এসেছিল ব্রিটেনের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে। নিমন্ত্রণকর্তা ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন। এতটুকু দ্বিধা না করে সহজ অথচ দৃপ্ত ভঙ্গিতে গভর্নরকে আশুতোষ জানিয়ে দিলেন, মায়ের ইচ্ছে নেই তাঁর বিদেশযাত্রায়। আবারও অনুরোধ : ‘‘Tell your mother the Viceroy and Governor General of India commands her son to go.” আশুতোষের উত্তর : “Then I will tell the Viceroy and Governor General of India that Ashutosh Mukherjee refuses to be commanded by any other person except his mother, be he Viceroy and be he somebody higher still.”

জ্ঞানস্পৃহা ছাড়া নিজের কোনও চাহিদা নেই। অল্পেই তাঁর সন্তোষ—আশুতোষ নাম সার্থক। কিন্তু দেশমাতৃকার এতটুকু অপমান, আদর্শের এতটুকু ন্যূনতা সহ্য করেননি কোনওদিন। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের থেকেও বেশিমাত্রায় গর্জে উঠেছেন—ফুঁসে উঠেছেন তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদের আসন অলংকৃত করতে আবারও তিনি এলেন। লর্ড লিটন শিক্ষার আদর্শবিরোধী এমন কিছু অনৈতিক শর্ত আরোপ করলেন যাতে ছাত্রদের স্বাধীনতা খর্ব হয়। দৃঢ়চেতা আশুতোষ স্পষ্টভাষায় উচ্চারণ করলেন : ‘‘Freedom first, freedom second, freedom always.” প্রতিবাদ জানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পদ প্রত্যাখ্যান করলেন।

ট্রেনে একই কামরায় ইংরেজ মিলিটারি অফিসারের সহযাত্রী তিনি। মধ্যরাত্রে উঠে দেখেন তাঁর দামি জুতোজোড়া নেই। অসম্ভব বুদ্ধিমান আশুতোষ বুঝতে এক মিনিটও সময় নিলেন না কী ঘটেছে। অফিসারের ততোধিক মূল্যবান কোটটিকে মুহূর্তে নিক্ষেপ করলেন জানালার বাইরে। নিদ্রা-জাগ্রত লালমুখো সাহেবের মুখ আরও লাল! ক্রুদ্ধস্বরে জানতে চাইলেন—আমার কোট কোথায়? বাংলার মর্যাদাময় আভিজাত্যের প্রতীক আশুতোষের নির্লিপ্ত উত্তর : আমার জুতোজোড়াকে খুঁজতে গেছে।

আশুতোষ—যাঁর অসামান্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অসাধারণ আত্মমর্যাদাবোধ, গণিত-পদার্থবিদ্যা-আইন-পালি-ফারসি-রুশ ভাষায় বিচিত্রগামী জ্ঞানের দাপট—যেজন্য বিদেশের নাইট এবং

বাংলার পণ্ডিতসমাজ থেকে 'সরস্বতী' ও 'শাস্ত্রবাচস্পতি' উপাধিলাভ, তিনিই আবার এফ এ ক্লাসে গড়গড় করে মুখস্থ বলেন প্যারাডাইস লস্ট। কীভাবে পারেন এতটা! শ্রদ্ধা আর সত্যপালনেই যে মানুষ বড় হয়, তা যেন আর একবার প্রমাণ করলেন আশুতোষ তাঁর আবাল্য প্রাত্যহিক জীবনচর্যায়। বন্ধুদের কথা দিয়েছেন সাড়ে চারটেয় খেলতে যাবেন। আগ্রহের আতিশয্যে ছেলের দল এসে ডাক দিয়েছে চারটেয়। সঙ্গীদের অপেক্ষা করতে বলে সত্যবদ্ধ সময়ানুবর্তী আশুতোষ পড়ার টেবিল থেকে উঠলেন ঠিক সাড়ে চারটেয়।

প্রখ্যাত ফরাসি পণ্ডিত সিলভাঁ লেভি মন্তব্য করেছিলেন, ''Had this Bengal Tiger been born in France, he would have exceeded even George Clemenceau, the French Tiger. Ashutosh had no peer in the whole of Europe." এ-হেন মর্যাদাময় মানুষটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া-আসার পথে সরল বালকের মতো ঢুঁ মারতেন বউবাজারে ভীমনাগের সন্দেশের দোকানে—খেতেন ও খাওয়াতেন কাঁচাগোল্লা। নিমন্ত্রণবাড়িতে মুহূর্তে শেষ করে ফেলতেন দইয়ের হাঁড়ি। কোনও অবস্থায় কোনওদিন যাঁকে অপ্রস্তুত করা যায়নি, এক্ষেত্রেও তাঁকে 'গোঁফে যে দই লেগে রয়েছে' বলে অপ্রস্তুত করা গেল না। সঙ্গে সঙ্গে গোঁফের নিম্নাংশ থেকে গর্বিত উত্তর ঠিকরে বেরিয়ে এল—'এমন গোঁফ করেছি তাই।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য, বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের টেগোর ল লেকচারার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, ভারতীয় জাদুঘরের সভাপতি, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের সদস্য, হাইকোর্টের বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (পরপর চারবার), এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি, স্যাডলার কমিশনের সভ্য—'বাংলার বাঘ' এই মানুষটিকে ভারত সরকার সম্মান না দেখিয়ে, মর্যাদা দান না করে পারেনি।

চার পুত্র ও তিন কন্যার পিতা আশুতোষ ছিলেন সন্তান-অন্তপ্রাণ। বড়মেয়ে কমলা বাল্যবিধবা হলে তিনি সমাজের সমালোচনাকে উপেক্ষা করে তার পুনর্বিবাহ দেন। তার অকালমৃত্যু পিতাকে অন্তরে বিধ্বস্ত করেছিল।

পাটনায় ২৫ মে ১৯২৪ শেষরাত্রে মৃত্যু হল আশুতোষের। গঙ্গায় যেন সূর্যাস্ত হল। আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত এই ঘটনা বাঙালির হৃদয়ে শেলের মতো বিঁধেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, ''মাথার উপর থেকে ছাত বা ছাতা যাই সরে যাক দুটোকেই আবার যোগাড় করে নেওয়া চলে, কিন্তু আকাশ সরে গেলে মাথার উপরে সাত থাক্ চাঁদোয়া খাটিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। আকাশের মতো বৃহৎ এবং উদার সেই মহাপুরুষের অভাবে আমাদের শিক্ষার রাজত্বে কতখানি অন্ধকারের সৃষ্টি হল, কত ভয়ের লক্ষণ সমস্ত দেখা গেল, তা এই শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যাঁরা আজ নাড়া-চাড়া করছেন তাঁরাই জানেন।" তাঁর মৃত্যুর পর নব্বই বছর অতিক্রান্ত। কিন্তু সেই শূন্যতা এখনও অপূরণীয়।

তাঁরই প্রদর্শিত পথে আমরা এগিয়ে চলেছি। আমরা হয়তো আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারি এই ভেবে যে, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা আজ বহুগুণ বেড়েছে। আশুতোষের স্বপ্ন আজ সার্থক! তবু প্রশ্ন থেকেই যায়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মনে করতেন শুধুমাত্র ডিগ্রিলাভই উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, জ্ঞানপিপাসু প্রকৃত মানুষ তৈরিই ছিল তাঁর লক্ষ্য। শিক্ষার অঙ্গনকে কলুষতামুক্ত করতে পারলে তবেই সার্ধশতবর্ষে তাঁর স্মরণমননের অধিকার লাভ করব আমরা।